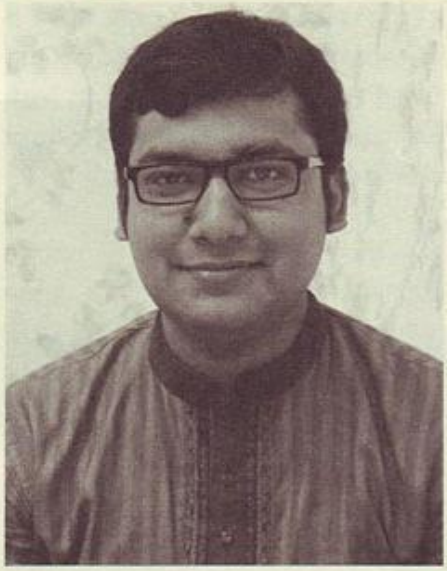

**ইমরান আজাদ**
*প্রভাষক, আইন ও মানবাধিকার বিভাগ*
*ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক*

# রিভিউ : বাঙালি ব্যারিস্টারদের ইতিহাস

ব্রিটিশদের কাছ থেকে পাওয়া ভিনদেশি আইন-ব্যবস্থার উত্তরাধিকার এবং ঔপনিবেশিক মানসিকতার কারণে পেশাগত আভিজাত্যের দিক থেকে 'ব্যারিস্টার' শব্দটি বহুকাল ধরে একধরণের ঐতিহাসিক স্থান দখল করে আছে আমাদের আইন ও বিচার-ব্যবস্থার অভিধানজুড়ে। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে এসেছেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর। শুধু ভারতের নয়, পুরো এশিয়ার প্রথম ব্যারিস্টার বলা হয় তাঁকে। এরপর ব্যারিস্টার হবার তীব্র বাসনা নিয়ে প্রথমদিকটায় যেসব বাঙালি বিলেতে পাড়ি জমান এবং ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরেও আসেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাখালদাস হালদার, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ আহমদ আলি, তারকানাথ, সৈয়দ আমীর আলি, কৃষমোহন চট্টোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, বিহারীলাল গুপ্ত প্রমুখ। ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনসহ সর্বভারতীয় পর্যায়ে তাদের বিশেষ রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবদান আজো চিরভাস্বর।

ব্রিটিশ শাসনের গণ্ডির মধ্যে থেকে ব্রিটিশদের দেশে গিয়ে ব্যারিস্টার হবার ইচ্ছা বা অভিপ্রায়কে খুব সহজে 'ব্রিটিশ-জীবনের-প্রতি-মোহ' বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে সত্যও বটে। কিন্তু এই মোহ ছাড়াও আরো কিছু বিষয় কাজ করেছিল, যে কারণে বাঙালিদের ব্যারিস্টার হওয়ার ইতিহাস এখনো অনেক গবেষকের কাছে একটি আগ্রহের বিষয়।

মাসিক *লিগ্যালইস্যু*'র চতুর্থ সংখ্যার প্রচ্ছদ-প্রবন্ধ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে প্রখ্যাত গবেষক গোলাম মুরশিদের "বাঙালি ব্যারিস্টারদের ইতিহাস" শীর্ষক নিবন্ধটি। এখানে তিনি ব্রিটিশ আমলে মধ্যবিত্ত বা উচ্চ-মধ্যবিত্ত বাঙালিদের ব্যারিস্টার হওয়ার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবকগুলো অনুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, ব্যক্তির 'ধর্মীয় অবস্থান' কীভাবে পেশাগত আভিজাত্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারে। গোলাম মুরশিদের ভাষায়, "জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর থেকে আরম্ভ করে বিহারীলাল গুপ্ত পর্যন্ত যাঁরা ব্যারিস্টার হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রমোহন এবং মাইকেল ছিলেন খৃস্টান। উমেশচন্দ্র ছিলেন খৃস্টান-প্রভাবিত। আর মনোমোহন ঘোষ ছিলেন ব্রাহ্ম। সৈয়দ আহমদ আলি মুসলমান, তা তাঁর নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে তারকানাথ প্রথম সত্যিকারের হিন্দু ব্যারিস্টার। রমেশচন্দ্র

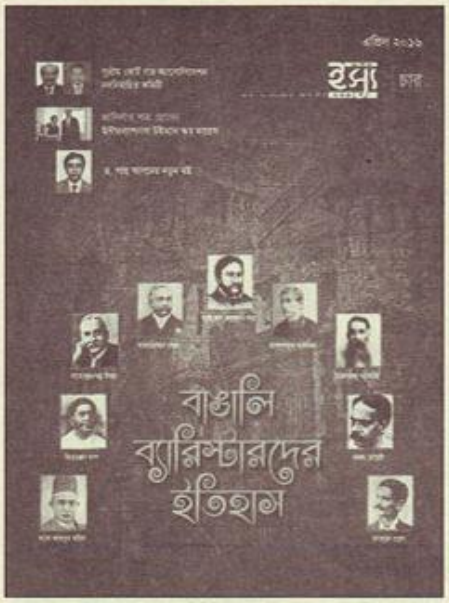


*মাসিক লিগ্যালইস্যু'র চতুর্থ সংখ্যার প্রচ্ছদ*

এবং বিহারীলাল ব্যারিস্টারি পাশ করে এই হিন্দুদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। ওদিকে, লেখাপড়ায় পিছিয়ে থাকা বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে কেউই ততোদিনে ব্যারিস্টার হননি। এমনকি, ব্যারিস্টারি পড়তে যাওয়ার মতো আকাঙ্ক্ষা এবং সঙ্গতিও তাঁদের কারো মধ্যে ছিল কিনা, সন্দেহ হয়।"

ব্যারিস্টারি পড়তে যাওয়া অনেকের জন্য যে শুভকর কোনো বিষয় ছিল না, তাঁরা তা দেশে ফিরে আসার পর টের পান। পরিবার ও সমাজ থেকে অনেকে অন্যায় আচরণ পাওয়া শুরু করেন। অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের তুলনায় সামাজিক রীতি-নীতি বা ট্যাবু তাঁদের জন্য শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণস্বরূপ, বিলেত গমনের পর থেকে রাখালদাস হালদারের পিতা-মাতার ওপর সামাজিক চাপ আসা শুরু হয়। শ্বশুড়বাড়ি থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর তিনি তাঁর স্ত্রীকে কলকাতায় নিয়ে যান। গোলাম মুরশিদ লিখেছেন, "তখন বিলেত গেলে জাত যেতো কেবল কালাপানি পার হওয়ার জন্যেই নয়, তার পেছনে আর একটা বড় কারণ ছিল বিদেশে নিষিদ্ধ খাবার এবং পানীয় গ্রহণ। ...ইংরেজদের বাড়িতে অতিথি হয়ে তাঁদের খাদ্য-ঠান্ডা গরুর মাংস আর শুয়োরের মাংসই খেতে হতো রোজ রোজ। কবি দ্রিজেন্দ্রলাল রায়ের রচনা থেকেও আভাস পাওয়া যায়, বিলেতফেরতরা কি ধরনের নিষিদ্ধ খাদ্যের জন্যে একঘরে হতেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো নিষিদ্ধ খাদ্যের জন্যে একঘরে হতে হতো-এ কথা বললেও তিনি কোনো পানীয়ের কথা বলেননি। মনে হয়, হিন্দু সমাজের একটা অংশে– শাক্তদের মধ্যে যেহেতু মদ্যপান প্রচলিত ছিল, সে কারণে মদ্যপানের প্রতি সমাজের মনোভাব অত প্রতিকূল ছিল না। তা ছাড়া কলকাতাতেই ইংরেজি শিক্ষিতরা প্রচুর মদ্যপান করতেন। ওটা সমাজের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল।"

প্রথমদিকে হাতে গোনা কয়েকজন ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেতে গেলেও ১৮৭০ সালের পর থেকে বাঙালিদের মধ্যে ব্যারিস্টার হওয়ার সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। গোলাম মুরশিদ দেখিয়েছেন, যেখানে ১৮৬০-এর দিকে মাত্র আট-নয়জন ব্যারিস্টার হতে বিলেতে যেতেন, সেখানে ১৮৭০-এর দশকে গিয়েছিলেন দ্বিগুণের বেশি। এর একটা কারণ ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রেক্ষাপটে বঙ্গদেশে মামলা-মোকদ্দমা বেড়ে যাওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টসহ অন্যান্য কোর্টে বাঙালি ব্যারিস্টারদের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া। এছাড়াও অন্যান্য পেশার তুলনায় ব্যারিস্টারি পেশায় থাকলে দ্রুত ধনী হওয়া যায়– এমন একটা ধারণা তখন বিরাজ করত।

*(দেখুন পৃষ্ঠা ৫০)*

যখন আমি বের হয়ে আসি, তখন সবেমাত্র গোধুলি। রাত প্রায় নয়টা। ভাবুক হয়ে উঠার জন্য উপযুক্ত সময়। মাগরেবের নামাযের সময়টা এ কারণেই এভাবে সাজানো হয়েছে। 'I met the man who is still dominating the legal field by laying down the law.'

১৯৭৭ সালে The Times-এ লর্ড স্কারম্যান লিখেছিলেন: 'আমাদের বিচার বিভাগের ইতিহাস থেকে বিগত পঁচিশ বছর বিস্মৃত হবে না। এটা ছিল লিগ্যাল এইড, ল' রিফর্ম এবং লর্ড ডেনিংয়ের যুগ।' With respect if we may say so, that is it! ১৯৭৪ সালের লেবার পার্টির সরকার ইউনিয়নসমূহের হাতে সীমাহীন ক্ষমতা ছেড়ে দেয়। ডেনিং বজ্রধ্বনি দিয়ে উঠেন– 'in contemplation or furtherance of a trade dispute' এই শব্দগুচ্ছের অর্থ আইনি পদক্ষেপ (court action) থেকে দায়মুক্তি বোঝায় না।

যে কোন যুক্তিবান মানুষের নিকট সঠিক মনে হবে- এই মানদণ্ডে আইন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন লর্ড ডেনিং। ইংরেজ বিচারকদের সৃষ্টি এই ব্যক্তি হল- The man on the Clapham Omnibus (Lord Denning tries to interpret the law in the light of what the reasonable man might consider right- the man on the Clapham Omnibus- a certain of English Judges!) উচুঁ বৃক্ষের শেকড় অনাড়ম্বরভাবেই অনেক গভীরে প্রোথিত থাকে। তিনি সর্তকবাণী করেছিলেন, ট্রেড ইউনিয়নকে প্রদত্ত ক্ষমতা হল ব্রিটেনের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তাঁর এই বক্তব্যে অনেকেই ক্ষুব্ধ করেছিল।

Olivar Twist-এর বাম্বল (Bumble) একটু টুইস্ট করে বলেছিলেন– "The law is an ass." মি. মিকায়েল ফুট বলেছিলেন– 'Denning is an ass.' বাম্বলের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত টুইস্ট ছিল– 'Then Denning is the law.'

মাস্টার অব দি রোলস-এর পরামর্শ অনুযায়ী মি. বিডলেকম্ব আমার প্রোগ্রাম পরিবর্তন করেন। তিনি আমাকে ফোনে জানান আমার সংশোধিত প্রোগ্রাম হল: visit to snare brook Crown Court.

*[লেখাটির শিরোনাম সম্পাদক প্রদত্ত]*

উৎস : *'He reminded me of a great sage', Those were the days, 1986, pp: 5-9*

অনুবাদ করেছেন *রাশেদ রাহম*

---

*(৫৬ পৃষ্ঠার পর থেকে)*

তবে সে সময় 'রক্ষণশীল বাঙালি সমাজে' পুরুষদের প্রভাব এতটাই ছিল যে বাঙালি নারীদের মধ্যে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেতে যাওয়ার প্রবণতা তখনো সৃষ্টি হয়নি। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো মুসলমানরা এক্ষেত্রেও পিছিয়ে ছিল। ১৮৮০ সালের পর থেকে মূলত বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেতযাত্রা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই রক্ষণশীল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও ধর্মীয় আচরণ এবং পেশাগত বিপত্তি লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের ধারণাকে তখন আরো প্রকট করে তোলে। শুধু বঙ্গদেশেরই নয়, খোদ আমেরিকাতেও এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি তখনকার সময়ে দেখতে পাওয়া যায়। ১৮৭২ সালে আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট *ব্রডওয়েল বনাম স্টেট অব ইলিয়নিয়* মামলায় ঘোষণা করেন যে, আইন পেশায় বিবাহিত নারীদের সুযোগ দেওয়া উচিত নয়– এই কারণে যে, নারীদের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে স্ত্রী এবং মায়ের ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করা। এমনকি ১৯১৪ সালে *ব্রিটিশ বেব বনাম দ্যা ল সোসাইটি* (১৯১৩) মামলায় কোর্ট অব আপীল ল সোসাইটির পক্ষে রায় দিয়ে বলেন যে, নারীদের সলিসিটর হিসেবে প্রফেশনাল পরীক্ষায় বসার কেনো অধিকার নেই। কোর্ট এই বলে যুক্তি দেন যে, সলিসিটরস অ্যাক্ট, ১৮৪৩ অনুযায়ী 'পারসন' বা 'ব্যক্তি'র সংজ্ঞায় নারীরা অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রথম বাঙালি নারী ব্যারিস্টারদের ইতিহাস জানা না গেলেও এটা জানা যায় যে, ভারতীয় উপমহাদেশে কর্নেলিয়া সোরাবজি হচ্ছেন প্রথম ভারতীয় নারী, যিনি ১৮৯৬ সালে প্রথম ভারতের ব্রিটিশ কোর্টে মামলা নিয়ে লড়াই করেন। পরবর্তীতে ১৯২১ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের আইনজীবী হিসাবে উনি তালিকাভুক্ত হন। ভারতীয় উপমহাদেশে ১৯২৩ সালে দ্যা লিগ্যাল প্র্যাকটিশনারস (উইমেন) অ্যাক্ট পাশ করে নারীদের প্রথমবারের মতো আইন পেশায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর পাকিস্তান আমলে ১৯৬৫ সালে *দ্যা লিগ্যাল প্র্যাকটিশনারস এন্ড বার কাউন্সিল অ্যাক্ট* প্রণয়ন করে ১৯২৩ সালের আইনটি বাতিল করা হয়। নতুন আইনে একইভাবে আইন পেশায় লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করা হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার *দ্যা বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনারস এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার* ঘোষণা করে ১৯৬৫ সালের পাকিস্তানি আইনটি বাতিল করে এবং আইন পেশায় লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যকে নিরুৎসাহিত করে।

তৎকালীন পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের প্রথম বাঙালি নারী ব্যারিস্টার হওয়ার গৌরব লাভ করেন সালমা সোবহান। ১৯৫৯ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি ইংল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টারি পড়া শেষ করেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনীমূলক যে লেখাটি বর্তমান সংখ্যায় ছাপানো হয়েছে, তার জন্য মাসিক *লিগ্যালইস্যু* বিশেষ ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

ব্যারিস্টার সালমা সোবহান ছাড়াও আরো যাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রান্তিকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি-মানস গঠনে ও বাংলাদেশে মুক্তি-আন্দোলনে একনিষ্ঠ সংগ্রাম করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে ব্যারিস্টার ড. কামাল হোসেন এবং ব্যারিস্টার এম আমীর-উল-ইসলাম অন্যতম। মুজিবনগর সরকারের হয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা-পত্র রচনা এবং ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য সংবিধান রচনা— এসবই তাঁদের চূড়ান্ত দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ, যা বাংলার মানুষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

মাসিক *লিগ্যালইস্যু*'কে ধন্যবাদ বাঙালি ব্যারিস্টারদের ইতিহাস পাঠকদের সামনে তুলে ধরার জন্য। এর মাধ্যমে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের এক অজানা অধ্যায় উন্মোচিত হল। এই ইতিহাস ভবিষ্যতের আইন পেশায় যোগদানে ইচ্ছুক আইন-শিক্ষার্থীদের জন্য অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করবে বলে আশা করি।

প্রচ্ছদ প্রবন্ধের পাশাপাশি আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা ছাপা হয়েছে এই সংখ্যায়। 'ব্যারিস্টারদের তীর্থস্থান: ইনস্ অব কোর্ট' শীর্ষক সংকলিত নিবন্ধটি সম্ভবত এই বিষয়ে বাংলায় লিখিত প্রথম কোন রচনা। ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস স্মারক হিসাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এবং আইনের ধারাবাহিকতা ও প্রয়োগ আদেশ–১৯৭১, '(অ)বিচার' শিরোনামে ইলা মিত্রের ঐতিহাসিক জবানবন্দির পুনর্মুদ্রণ ছিল দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। নিয়মিত বিভাগ 'আইন ব্যক্তিত্ব'-এ এবার ছাপা হয়েছে বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনীমূলক সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যবহুল একটি রচনা। 'বই আলোচনা' বিভাগে ছিল 'ড. শাহ আলমের নতুন বই: বাংলাদেশের আইনের সংস্কার ও আইন কমিশন'। এছাড়াও অন্যান্য বিভাগে ছিল সুপ্রীম কোর্ট বারের নতুন কমিটির খবর, সুপ্রীম কোর্ট বারের নির্বাচনী ইশতেহার এবং অধস্তন আদালতের বিচারকদের কর্মস্থল ত্যাগ না করা সংক্রান্ত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের একটি বিজ্ঞপ্তি। আরো ছিল সদ্য প্রয়াত প্রখ্যাত আইনজীবী মাহমুদুল ইসলাম স্মরণে মিজানুর রহমান খানের সুলিখিত একটি নিবন্ধ।

সব মিলিয়ে মাসিক *লিগ্যালইস্যু*'র চতুর্থ সংখ্যা ছিল দারুণ সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের বিচারবিভাগের ইতিহাস পুনর্নির্মাণ এবং আইন ও বিচারবিভাগের জনভাষ্য তৈরি করার লক্ষ্যে মাসিক *লিগ্যালইস্যু* যে যাত্রা শুরু করেছে, তা যেন অব্যাহত থাকে এই শুভকামনা করি।